অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়- ধারা এ্যাড

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮
০১ জুন ২০১১

বাণী

০১ জুন থেকে তিন মাসব্যাপী 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা ২০১১' শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বৃক্ষ জীবন ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, অকৃত্রিম বন্ধু। জীবের দৈনন্দিন খাদ্য, আশ্রয়সহ নানাবিধ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে ধরিত্রীকে বাসযোগ্য রাখতে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। "বৈশ্বিক উষ্ণতা" জলবায়ু পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বলে বিবেচিত। বৃক্ষ বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের মাধ্যমে উষ্ণতা হ্রাস করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কমাতে সহায়তা করে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্য "দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাঁটি" যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বৃক্ষ কেবল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা নয়; কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, বাসস্থান, চিকিৎসা, জ্বালানী তথা জীবন ও জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে, দেশকে সবুজে সবুজে ভরে তুলতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ব্যাপকভাবে গাছ লাগানোর জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

যাঁরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার ২০১০ ও বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয়; পুরস্কার ২০১০ এ ভূষিত হয়েছেন এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে লভ্যাংশ পাচ্ছেন তাঁদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রকৃতি ও দরিদ্র জনগণের জন্য সামাজিক বন

ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ
প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ

ভূমিকা ঃ সামাজিক বনায়ন হলো জনসাধরণ, বিশেষ করে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামীণ জনগণের অর্থনেতিক, সামাজিক ও বাস্তসংস্থানিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন। সামাজিক লক্ষ্য শুধুমাত্র গাছ নয়, গ্রামের দরিদ্রজনগোষ্ঠীও এর লক্ষ্য। শুধু গাছ লাগানো ও সে সব গাছের যত্ন নেয়া নহে, বরং গাছ রোপণ ও পরিচর্যাকারীরা যাতে লাগোনো গাছে সুফল পাওয়ার আগ পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তারও নিশ্চয়তা বিধান। এফ.এ.ও. এর মতে সামাজিক বনায়ন হল 'বনায়ন কার্যক্রমে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্তকরণ। সমাজ বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে আরো বড় পরিসরে দেখেন। তাদের মতে সামাজিক বনায়ন হল গ্রামীণ জনগণের প্রয়োজনে বনায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আহরণ পর্যন্ত সকল কাজে তাদের সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ। উপর্যুক্ত সকল মতবাদের মধ্যে ১টি বিষয় সুস্পষ্ট যে, সামাজিক বনায়নের মূল বিষয় হল 'জনগণের জন্য বন'।

সামাজিক বনায়নের ক্রমবিকাশ ঃ ১৯৭০ দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত ভাবা হত যে, সরকার কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন বা বনজ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল আপনাআপনিই দরিদ্র জনগণের কাছে পৌছে যাবে। এ ধারণা থেকেই বড় বড় বন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এসব প্রকল্প ছিল শুধু মাত্র বৃক্ষ কেন্দ্রিক। বন ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত বন বিভাগ বনজ সম্পদ সৃষ্টি, রক্ষা ও আহরণ এর জন্য সরকার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু এতে তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। এরই বাস্তবতায় এফ.এ.ও. সর্বপ্রথম "স্থানীয় জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য বনায়ন" শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। যা সমগ্র বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যার ধারাবাহিকতায় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ১৯৭৮ সনে অনুষ্ঠিত '৮ম বিশ্ব বন কংগ্রেসে' এর প্রতিপাদ্য হিসেবে 'জনগণের জন্য বন' শ্লোগানটিকে বেছে নেয়া হয়।

বননীতি বা শক্তিশালী বন আইন দ্বারা কোনভাবেই সরকারী বনকে রক্ষা করা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে সরকারী বন কর্মকর্তা বা কর্মচারী দিয়ে গ্রামীণ জনগণকে ফলপ্রসূভাবে বন রক্ষা ও উন্নয়নে নিয়োজিত করা সম্ভবভ হচ্ছিল না, কেননা এ ধরণের কাজে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। যুগ যুগ ধরে লালিত রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে বন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে দিচ্ছিল। ঐ সময় অনেক দেশের সরকার গভীরবাবে অনুভব করল যে, গ্রামীণ জনগণের সক্রিয় অংশীদারিত্ব ভিন্ন প্রণীত কোন বন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা বা উন্নয়ন কর্মসূচি সরকারী বনে হোক বা ব্যক্তিগত ফার্মেই হোক সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নহে।

এ সময় কিছু কিছু দেশে স্থানীয় জনগণের মধ্যে এককভাবে বা যৌথভাবে বনায়নকে ফার্মিং হিসাবে নিতে দেখা যায়। যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও কৃষক ব্যক্তিগতভাবে তাদের স্থানীয় চাহিদা বা প্রয়োজন এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। উদাহরণ হিসাবে ১৮০০ শতকের মায়ানমারের Tangya System - কে বলা যেতে পারে যাহা পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম, আসাম, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

জনগণের এই স্থানীয় জ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞানীরা লিপিবদ্ধ করেন এবং ফরেস্টারদের নিয়ে তা বহুল প্রচার ও বিকাশ ঘটান। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিটির আরো উন্নয়ন সাধিত হতে থাকে। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝিতে Rapid Rural Appraisal (RRA) এবং Praticipatory Rural Appraisal (PRA), ১৯৮০ এর দশকের মধ্যভাগে Praticaipatory Learning Action (PLA) নামে সামাজিক জরিপের অত্যাধুনিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। দেখা যায় যে, এ পদ্ধতি সমূহ গ্রামীণ জনগণের সাথে সংলাপে খুবই উপযোগী এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়নে খুবই কার্যকরী।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে বনের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে বর্ধিত জনসংখ্যার দৈনন্দিন জীবন ধারণের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বন সংকুচিত হতে থাকে। কৃষি ভূমির স্বল্পতার কারণে বনভূমির শ্রেণী পরিবর্তন হয়ে কৃষি ভূমিতে

পরিণত হতে থাকে। বিষয়টি নীতি নির্ধারকদের ভাবিয়ে তোলে। ১৯৭৮ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব বন কংগ্রেসের সাফল্য নীতি নির্ধারকদের নতুন দিক নির্দেশনা প্রদানে অনুপ্রাণিত করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বন নীতিতে সরকারী বনভূমি এবং পতিতভূমিতে পারস্পরিক উদ্যোগে বনায়ন করার ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রকৃত অর্থে সরকারী পর্যায়ে সর্বপ্রথম সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম শুরু হয় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি বৃহত্তর জেলায় যথা- দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও যশোর। এ প্রকল্প কার্যক্রম ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত চলে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল জ্বালানী কাঠ, পশুখাদ্য, ফল ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি। বনায়ন কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সফলতা অর্জন করে। এ প্রকল্পে প্রথমবারের মতো বনায়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা হয়।

যদিও উল্লেখিত প্রকল্পটি বাংলাদেশের সামাজিক বানায়নের ইতিহাসে ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। তথাপিও একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। তা হ'ল ১৯৬৭ সালে ঢাকা ও রাজশাহী বন বিভাগে ২টি নার্সারি স্থাপন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মাঝে উৎপাদিত চারা বিনা পয়সায় সরবরাহ করা। প্রকৃত পক্ষে এটি ছিল বাংলাদেশ সামাজিকবনায়নের ধারণাগত স্তরের (conceptual stage) প্রথম কার্যক্রম।

সামাজিক বনায়নের অর্জনসূমহ ঃ

ক) কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনঃ গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক বনায়ন বিশাল ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করছে। 'সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় পাঁচ; লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে নিজেদের উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করেছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে নার্সারী সৃষ্টি করে বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বৃহৎ সংখ্যক ঝুমিয়া পরিবারকে কৃষি বনায়ন প্রযুক্তির মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের বহু ঝুমিয়া পরিবার বন বিভাগের এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে নিজেরাই স্থায়ী বসতী স্থাপন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। ১৯৯৯ হতে ২০১১ সন পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বাগান বিক্রয় করে ৮৮ হাজার উপকারভোগীর মাঝে ১৫৩ কোটি টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া পুনবনায়নের জন্য ৩৩ কোটি টাকা ট্রি ফার্মিং ফান্ড সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ১৫৩ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প হতে সরাসরি নগদ লভ্যাংশ পাওয়ার এ দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে বলে জানা যায় না। উপকারভোগীগণের দারিদ্রতা নিরসনে সামাজিক বনায়নের এ সাফল্য ধরে রেখে সামাজিক বনায়নের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের তীব্র আগ্রহ আমাদের আরো বেশী অনুপ্রাণিত করেছে। সরকারী বনেও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজস্ব অর্থায়নে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে।

খ) নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টিঃ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ মহিলাদের উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলারা স্বাবলম্বী হতে শিখেছে। গ্রামীণ নারীর মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নে সামাজিক বনায়ন ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

গ) নার্সারী সৃজন ও প্রশিক্ষণঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় সারাদেশব্যাপী নার্সারী সৃজন, বাগান উত্তোলন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। বন বিভাগ কিছু কিছু এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় নার্সারীও স্থাপন করে দিয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে এমন কোন ইউনিয়ন পাওয়া যাবে না যেখানে ব্যক্তি মালিকানায় কোন নার্সারী নেই। চারা লাগানোর মৌসুমে গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি হাট-বাজারেই চারা বিক্রয়ের ১টি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে দেখা যায়। এমনকি ভ্যান গাড়ীতে করেও পাড়া-মহল্লায় চারা বিক্রয় করতে দেখা যায়। যা সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির বিশাল সাফল্য। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি এখন সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে চারা রোপণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। জনসাধারণের নিকট বিনামূল্যে চারা বিতরণ করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নাম মাত্র মূল্যেও সরকারী নার্সারী হতে চারা বিক্রি করা হচ্ছে।

ঘ) মরুময়তা রোধ ঃ সামাজিক বনায়নে ফলে বরেন্দ্র অঞ্চল আজ সবুজ আর সবুজের সমারোহ। বনায়নের ফলে উত্তরবঙ্গে জলবায়ু ও আবহাওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এক সময় যে অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর বহুনীচে নেমে গিয়েছিল সামাজিক বনায়নের ফলে তা আবার উঠে এসেছে। বৃক্ষাচ্ছাদন মরুময়তাকে কিভাবে রোধ করে তার প্রকৃত প্রমাণ আমাদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল।

ঙ) বনজ সম্পদ সৃষ্টি ঃ সামাজিক বনায়নের ফলে দেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। উপকূলীয় এলাকায় যে সকল ভূমি স্থায়ীরুপ ধারণ করেছে সেখানে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে নন-ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সরকারী সংরক্ষিত বনেও সামাজিক বনায়নের আওতায় বাগান সৃজনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এ পর্যন্ত প্রায় ০.৪০ মিঃ হেঃ ভূমি সামাজিক বনায়নের আওতায় বৃক্ষ আচ্ছাদিত হয়েছে। ন্যাশনাল ফরেস্ট এসেসমেন্ট ২০০৭ এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, গ্রামীণ উডলটের Growing Stock ১৯৮১ সনের তুলনায় ৪.৫ ঘন মিঃ/হেঃ এর স্থলে ১০.৫ ঘন মিঃ হেঃ এ উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশের মোট ভূমির ৫০% এলাকায় কম-বেশী পরিমাণে বৃক্ষের আচ্ছাদন রয়েছে (১০% হতে ৯০% আচ্ছাদন)। যা সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির অবদান হিসাবে স্বীকার্য। সামাজিক বনায়ন দেশের কাঠ ও জ্বালানী সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের জ্বালানী কাঠের মোট চাহিদার সিংহভাগ যোগান দেয় গ্রামীণ বন। যা সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির বিশাল সাফল্য।

চ) প্রান্তিক ও পতিত ভূমি বনায়ন ঃ বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে ভূমি সংকট একটি প্রধান সমস্যা। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারী বনভূমির পাশাপাশি জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রান্তিক ভূমি যেমন- সড়ক, সংযোগ সড়ক, রেল লাইন, চরাঞ্চল, বাঁধ এমনকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পতিত ভূমিতে বনায়নের মাধ্যমে ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে।

ছ) পরিবেশের উপর ইতিবাচনক প্রভাবঃ জলবায়ু পরিবর্তন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থিতিশীলতায় সামাজিক বনায়নের বিকল্প নেই। বনায়ন কর্মকান্ড বায়ুমন্ডলের কর্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্যতা রেখে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া রোধ করছে। সামাজিক বনায়নের ফলে গ্রামীণ বনের কার্বন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পরিবেশ সংরক্ষণে সামাজিক বনায়ন অবদান রেখে চলেছে।

সামাজিক বনায়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঃ

বাংলাদেশ ফরেষ্ট্রী সেক্টর আউটলুক স্টাডি গবেষণা পত্র হতে দেখা যায় যে, অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি, খাসভূমি, সরকারী বনভূমি, প্রান্তিক ও পতিত ভূমি এবং উঁচু কৃষিভূমিসহ সারা দেশে ৪.৬৫ মিলিয়ন হেঃ ভূমি সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা সম্ভব যা দেশের মোট ভূমির প্রায় ৩১.০%। উল্লেখিত ৪.৬৫ মিলিয়ন হেঃ ভূমিকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় ১০ বছর মেয়াদী বনায়ন কার্যক্রমে আনা গেলে ৪৬.৫ মিলিয়ন ঘন মিটার কাঠ ও জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাবে। অধিকন্তু গ্রামীণ দ্ররিদ্র জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গতানুগতিক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব না হওয়ায় বিকল্প হিসেবে ১৯৮০ দশকের শুরুর দিকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি শুধুমাত্র বনায়ন কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বন ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক বনায়ন ধারণার তেমন কোন বিকাশ লাভ করেনি। এরই মধ্যে পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বিস্তার লাভ করে এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বন বিভাগ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগণ ও সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার বন বনভূমি এবং এর চার পাশের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সম্ভব, ইতোমধ্যে যার ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮
০১ জুন ২০১১

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ১লা জুন থেকে সারাদেশে তিনমাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী গ্রীন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। এতে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হচ্ছে এবং দেখা দিয়েছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের মত মারাত্মক সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও নতুন নতুন বন সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা এ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারি।

আমাদের বাঁচার জন্য অক্সিজেন হতে শুরু করে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং রোগ নিরাময়ের ঔষধ আমরা বৃক্ষরাজি হতে পেয়ে থাকি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তাই বৈশ্বিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও মরুকরণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আসন্ন বর্ষা মওসুমে দেশের সকল গ্রাম ও নগরের পতিত জমি এবং নদী, জলাশয় ও রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ আচ্ছাদন গড়ে তোলার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ হিসেবে সারাদেশে বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এসব মেলা থেকে চারা সংগ্রহ করে দেশের সকল নাগরিককে অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮
০১ জুন ২০১১

বাণী

মানব জীবনে বৃক্ষ অপরিহার্য। জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হয় বৃক্ষ হতে আসা বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণের মাধ্যমে। বৃক্ষ আমাদের ফল দেয়, ফুল দেয়, সুশীতল ছায়া দেয়। ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা, বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করে। জীবন ও জীবিকার জন্য বৃক্ষরাজির কোন বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে, প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে, প্রাণীকূলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষ রোপণ, বনাঞ্চল সৃষ্টি ও সংরক্ষণ অতি জরুরি।

কার্বন মজুদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ডিফরেস্টেশন ও ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন কমাতে হবে, বনাঞ্চল সংরক্ষণ করতে হবে এবং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম জোরদান করতে হবে যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার অন্যতম সহায়ক উপাদান ও শক্তি হচ্ছে বৃক্ষ। বৃক্ষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে নির্মল পরিবেশ দান করে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বনভূমি আর বনজ সম্পদের উপর চাপ ক্রমশই বাড়ছে। বাড়ছে বসত-বাড়ী, শহর-নগর, শিল্প কারখানা আর কৃষি জমির চাহিদা। আর প্রতিনিয়ত কমছে বন-জঙ্গলের পরিমাণ। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় উন্নতমানের দেশীয় উচ্চ ফলনশীল বনজ, ফলজ ও ঔষধি চারা রোপণ অনস্বীকার্য।

বায়ু আর মাটি হচ্ছে পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবারের বৃক্ষরোপণ অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য "দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাঁটি" নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃক্ষ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি আর মরুময়তা রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বায়ু আর মাটিকে দূষণমুক্ত রাখতে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ জরুরি।

১ জুন হতে মাসব্যাপী সারাদেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হচ্ছে। ঢাকায় ১ জুন হতে ১ মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার বৃক্ষরোপণ অভিযানকে আরও গতিশীল করার জন্য, উন্নত প্রজাতি ও আধুনিক প্রযুক্তি জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সারাদেশে জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করেছে। এ সকল বৃক্ষমেলা হতে চারা সংগ্রহ করে রোপণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সমৃদ্ধকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য আমি আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই।

বৃক্ষরোপণে অনন্য অবদানের জন্য যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১০ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার-২০১০ পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি অন্যরাও এতে উৎসাহিত হয়ে বৃক্ষরোপণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেন। সামাজিক বনায়নের অংশীদার হিসেবে এ বছর যারা লভ্যাংশ পেয়েছেন তাঁদেরকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আগামী দিনগুলোতে তাঁরা আরও বেশী বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসবেন এবং অন্যদেরকেও বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণে অবদান রাখতে উৎসাহিত করবেন বলে আশা রাখি।

বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ সার্থক ও সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এম.পি

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮
০১ জুন ২০১১

বাণী

বৃক্ষ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৃক্ষ আমাদের চারপাশের পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য নির্মল পরিবেশ বিশেষ প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দেশকে সুরক্ষা, স্বাস্থকর পরিবেশ সৃষ্টি ও ভূমি ক্ষয়রোধের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক বৃক্ষরোপণ। এতে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সৃষ্টি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ অপ্রতুল। তাই বিস্তীর্ণ উপকূলীয় নতুন জেগে উঠা চর অঞ্চলে বনায়ন করে দেশের বনাঞ্চল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ বনায়নে অংশগ্রহণ করছেন। তা ছাড়া সারা দেশে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সরকারী ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপকহারে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশের পরিবেশের